Vol. 50 | No. 1 | 2012

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রশীদ করীমের প্রবন্ধ : সমকালীন সাহিত্য ও সাহিত্যিক প্রসঙ্গ

Volume	50
Issue	1
Year	2012
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Momenur Rasul
Published online	October 1, 2012
DOI	10.62328/sp.v50i1.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v50i1.5
Pages	১২৯-১৪৭
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

রশীদ করীমের প্রবন্ধ : সমকালীন সাহিত্য ও সাহিত্যিক প্রসঙ্গ

Check for updates

মোমেনুর রসুল*

চিন্তার গভীরতায়, মননের ঔজ্জ্বল্যে, প্রতিভার দ্যুতিময়তায় রশীদ করীম (১৯২৫-২০১১) বাংলা সাহিত্যে অনন্যসাধারণ ও ব্যতিক্রমধর্মী লেখক হিসেবে পরিচিত। চার দশকের বিস্তৃত পট পরিসরে তিনি কখনও ঔপন্যাসিক, কখনও গল্পকার, কখনও প্রাবন্ধিক, আবার কখনওবা অনুবাদকের পরিচয় নিয়ে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন। প্রতিটি পরিচয়েই তিনি তাঁর প্রাতিস্বিক প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখতে পেরেছেন। কথাসাহিত্যিক হিসেবে রশীদ করীম বহুল আলোচিত হলেও তাঁর প্রাবন্ধিক সত্তা গুরুত্বহীন নয়। লেখকজীবনের সূচনাপর্বে ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনায় অসাধারণ মুন্সীয়ানা প্রদর্শন করলেও পরবর্তী সময়ে প্রবন্ধ রচনায় তিনি গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। এ প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তাঁর প্রাজ্ঞ অভিমত নিম্নরূপ :

> আমাদের দেশে অসংখ্য দৈনিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকা বেরুচ্ছে। এসব পত্রিকা থেকে কলাম প্রবন্ধ লেখার অনুরোধ আসে। তাই বছর দুই থেকে নিয়মিত কলাম লিখছি। এদের অনুরোধ রক্ষা করতে গিয়ে যেমন কলাম বা প্রবন্ধ লিখছি, তেমনি আর্থিক কারণেও লিখছি। ...এখন উপন্যাস লেখা একেবারেই হচ্ছে না। উপন্যাস লেখবার জন্য অভিনিবেশ লাগে। সৃজনশীল কাজ বলো, মগজের কাজ বলো, এসব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শুধু উপন্যাসেই মনোনিবেশ করতে হয়। কেননা উপন্যাসের ক্ষেত্রে চরিত্র গঠন আছে, ঘটনার বিশ্লেষণ আছে, পরিবেশ তৈরি করার কাজ আছে, কাজেই এটা খুব সহজ কাজ নয়। এমনিতে আমি ধীর লয়ে লিখি তাই কলাম প্রবন্ধ লিখছি বলে উপন্যাসের প্রতি নজর দিতে পারছি না। (হামিদ ও পিয়াস, ২০১১ : ১২)

ধীর লয়ে লিখলেও রশীদ করীম তাঁর গভীর পঠন-পাঠন ও মননশীল চেতনায় প্রবন্ধ-সাহিত্যে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। রশীদ করীমের প্রবন্ধগুচ্ছ তাঁর উপন্যাসের মতোই স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। তাঁর প্রবন্ধের বিষয় বিচিত্র, বিশ্লেষণ হৃদয়গ্রাহী, মননের প্রকর্ষণাও রয়েছে বাক্যের আন্তঃসংগঠনে। তিনটি প্রবন্ধ সংকলনে[১] অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধসমূহ ধারণ করেছে একজন কৃতী লেখকের চিন্তাচর্চার প্রকৃত পরিচয়। এমনকি তাঁর ব্যক্তি-জীবন এবং লেখার নেপথ্যের কথা জানার জন্যেও এগুলো অপরিহার্য। তাত্ত্বিক প্রবন্ধের চেয়ে পাঠোদ্ধারমূলক প্রবন্ধ এবং ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণায় স্বচ্ছন্দ রশীদ করীম তাঁর প্রাবন্ধিক পরিচয়কে ছাপিয়ে গেছেন বহুলাংশে। কেবল মানুষের মন ও মননের বিষয় নয়, সঙ্গে যাপিত জীবনের বিভিন্ন দিকও তাঁকে আকৃষ্ট করেছে। ফলে তিনি সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্বের জীবনাচার নিয়ে রচনা করেছেন স্মৃতিকথা। লিখেছেন একই বিষয়ে একাধিক রচনার পাশাপাশি বেশ কিছু বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ। স্মৃতিচারণ এবং ব্যক্তিগত প্রবন্ধগুলোয় তিনি যতটা বিবরণধর্মী, বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধগুলোয় ততোধিক বিশ্লেষণাত্মক। বর্তমান প্রবন্ধ

---

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পরিসরে রশীদ করীমের প্রবন্ধে সমকালীন সাহিত্য ও সাহিত্যিক প্রসঙ্গে আমাদের পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করব।

কথাসাহিত্যের ন্যায় প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রেও দেশ-কালের বাতাবরণ বিশেষভাবে প্রভাব সৃষ্টি করে। লেখকের অন্তর্লোকে সমকালীন সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদির গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। প্রবন্ধের ব্যাপক পরিসরের মধ্যেও সমকালীন প্রসঙ্গ ও জীবনের বহুমুখী জটিল বিন্যাসের প্রতিফলন ঘটে। যে কোনো সচেতন প্রাবন্ধিকই তাঁর সৃষ্টির অক্ষরে সমকালকে ধরে রাখতে চান। তাই প্রবন্ধও অনেক সময় ইতিহাসের দলিল হিসেবে আমাদের কাছে ধরা থাকে। দেশে দেশে, কালে কালে শিল্পী-সাহিত্যিকদের রচনায় আমরা তাঁদের সমকালকে খুঁজে পাই— কখনো প্রত্যক্ষভাবে, কখনো পরোক্ষভাবে। মননশীল ও মুক্তদৃষ্টির অধিকারী রশীদ করীমের প্রবন্ধে সমকালীন সাহিত্যের বিভিন্ন দিক যেমন উন্মোচিত, তেমনি সমকালস্পর্শী সাহিত্যিক প্রসঙ্গও উপস্থাপিত। এ প্রসঙ্গে একজন বিশিষ্ট সমালোচকের স্পষ্ট উচ্চারণ :

> বর্ষীয়ান সাহিত্যিক হিসেবে সমকালীন এবং নবীন সাহিত্যকর্মীদের বিভিন্ন লেখালেখির যে তলস্পর্শী মূল্যায়ন তিনি করেছেন, তার বিস্তৃতি ও গভীরতা দেখেও আমরা মুগ্ধ হয়েছি। এখানেই তিনি একক ও সার্থক হয়ে আছেন। (সরদার, ২০১০ : ৩১৬)

মূলত সাহিত্য বিশ্লেষণের সময় রশীদ করীম লেখকের জীবন-অভীপ্সা ও সমকালীন সামাজিক-সাংস্কৃতিক পটভূমিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন। সাহিত্য মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সামগ্রিকতা আনয়নের এই প্রয়াস অবশ্যই প্রশংসনীয়।

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত রশীদ করীমের প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ *আর এক দৃষ্টিকোণ* চারটি অংশে বিভক্ত আঠারোটি প্রবন্ধের সমাহার। এর 'স্মৃতিচারণ' অংশে সন্নিবেশিত তিনটি রচনায় তিন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের সাহিত্যকৃতি মূল্যায়নের পাশাপাশি তাঁদের সঙ্গে তাঁর কী ধরনের সম্পর্ক, সম্পর্কের গভীরতা কতটুকু, এমনকি ওই সকল লেখক তাঁর সাহিত্যকর্মকে কীভাবে বিচার করতেন তার ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সমালোচক আবু সয়ীদ আইয়ুবকে নিয়ে লিখেছেন আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ 'কিছু স্মৃতিচারণ : আবু সয়ীদ আইয়ুব'। এ গদ্যে তিনি আবু সয়ীদ আইয়ুবের রচনার সযত্ন প্রচেষ্টার তুলনা করেছেন সয়ীদের গ্রামোফোন বাজানোর নৈপুণ্যের সঙ্গে। এ স্মৃতিচারণে আবু সয়ীদ আইয়ুবের প্রসঙ্গের চেয়ে রশীদ করীম নিজের প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছেন অনেক বেশি। সেখানে বুদ্ধদেব বসু, সৈয়দ আলী আহসানের প্রসঙ্গও এসেছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সয়ীদের সাহিত্যমানস ও রুচিবোধই প্রাধান্য পেয়েছে। প্রবন্ধ শেষে সয়ীদের সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন এরূপ :

> লেখার পরিমাণের চাইতে লেখার উৎকর্ষের ওপর আইয়ুবের ঝোঁক অনেক বেশি। খুব বেশি লিখলে লেখার প্রতি যত্নবান হওয়া যায় না, ফলে লেখার গুণ লাঘব হতে বাধ্য। অনেকগুলো চলনসই লেখার চাইতে কিছু কিছু উৎকৃষ্ট লেখার মূল্য অনেক বেশি। (রশীদ, ২০০৩ : ১৫)

এই অকপট স্বীকারোক্তিই প্রাবন্ধিক রশীদ করীমের গদ্যভাবনার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই প্রবণতা প্রবন্ধের সমাপ্তি বাক্যেও লক্ষণীয় :

> তাঁর কাছে আমার ঋণের অবধি নেই। আমার বহু ব্যস্ততার মধ্যেও এই অবসরে সেই বিরাট প্রতিভার কাছে সেই ঋণটুকু স্বীকার করে নিলাম। (রশীদ, ২০০৩ : ১৫)

'আরো স্মৃতিচারণ : সৈয়দ মুজতবা আলী' শীর্ষক রচনায় রশীদ করীম আলোচ্য বিষয়ের ভেতর সীমাবদ্ধ না থেকে অবগাহন করেছেন বিষয়কেন্দ্রিক অন্যান্য বৃত্তেও। তাই সেখানে তুলে ধরেছেন সৈয়দ মুজতবা আলীর ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক। মুজতবা আলীর মূল্যায়ন করতে গিয়ে প্রকাশ করেছেন বিনয়। এ প্রবন্ধেও আবু সয়ীদ আইয়ুবের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। বাংলা সাহিত্যের এই দুই দিকপালের কাছে প্রাবন্ধিক যা কিছু শিখেছেন তারও উল্লেখ রয়েছে এখানে। তাঁর মতে :

> আইয়ুব ও মুজতবা আলীর কাছে অনেক শিক্ষা লাভ করেছি। করেছি বলতে পারবো না, কারণ আমার নিজের সীমাবদ্ধতার জন্য তাঁদের চেষ্টা বৃথাই গেছে। তবে একটা জিনিস জেনেছি। তাঁদের দুজনকেই বলতে শুনেছি, সাহিত্যে পরিমাণের চাইতে উৎকর্ষের মূল্য অনেক বেশি। আইয়ুব তাই খুব কম লিখেছেন। মুজতবা আলীকে বেশি লিখতে হয়েছে। সম্ভবত যেসব বিষয়ে লিখতে তাঁর ইচ্ছে করে নি, তাও লিখতে হয়েছে। (রশীদ, ২০০৩ : ১৮)

পক্ষাঘাতগ্রস্ত সৈয়দ মুজতবা আলীকে হাসপাতালে দেখতে গিয়ে রশীদ করীম বিনয়াবনত হয়ে তাঁর লেখার প্রশংসা করে যা বলেছিলেন তা মুজতবা-মানসের এক উজ্জ্বল প্রান্ত। প্রাবন্ধিকের মূল্যায়ন এরূপ :

> প্রথমেই বলতে হয়, আপনার ভাষার কথা। লোকে গুরুচণ্ডালির-বাধা আজ আর মানে না। ভাষা থেকে ছোঁয়াছুঁয়ির বাধা একেবারে চলে গেছে। কিন্তু শুধু লেখ্য আর কথ্য ভাষার গুরুচণ্ডালির তো নয় কিংবা সংস্কৃত ভাষার গুরুচণ্ডালির নয়। আপনি একেবারে সংস্কৃত শব্দের পাশে আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন। টেকচাঁদ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী কিংবা অন্নদাশংকর রায়ের ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দ এসেছে পুষ্প বৃষ্টির মতো। নজরুল ইসলামের ভাষায় কালবৈশাখীর মতো। আর আপনার ভাষায় নিত্যকার সঙ্গীর মতো। (রশীদ, ২০০৩ : ২১)

অগ্রজ এই সাহিত্যিকের মৃত্যুর পর রশীদ করীম বেতার কর্তৃপক্ষের অনুরোধে তাঁর সম্পর্কে যা বলেছিলেন তাও প্রবন্ধের শেষে উল্লেখ করেছেন :

> তাঁর মৃত্যুর দিন রেডিও কর্তৃপক্ষ রেডিওর জন্য আমাকে কিছু বলতে বললেন। আমি শুধু বলতে পেরেছিলাম, বাংলা সাহিত্যের একজন প্রধান সেবক চলে গেলেন। সেই সঙ্গে চলে গেল, বাংলা সাহিত্য থেকে বসন্ত ঋতু। (রশীদ, ২০০৩ : ২২)

'সমরেশ বসুর সঙ্গে' রচনাটি পূর্ববর্তী রচনা দুটিরই অনুরূপ। এ রচনায় সমরেশ বসুর জীবনযাপনই প্রকাশিত। পাশাপাশি সমরেশ বসুর সাহিত্যিক প্রতিভা সম্পর্কে তিনি যে নিঃসংশয়, সেটা বারবার উল্লেখ করেছেন। এমনকি সমরেশ বসুর অসাধারণ গদ্যশৈলীর প্রশংসা করে তিনি বলেছেন :

> সমরেশ বসু একজন অসামান্য কীর্তিমান সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন সে সম্পর্কে কোনো বিতর্ক নেই। সেই সঙ্গে তিনি আমাদের কালের অদ্বিতীয় গদ্যশিল্পী। শুধু তাই নয়, তিনি মরচে পড়া, ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যাওয়া ভাষার বাহুতে, এমন এক নতুন রক্ত সঞ্চার করলেন, যে ভাষা প্রাণ লাভ করে লাফ দিয়ে উঠলো। খিস্তিখেউর আর পোস্তার ভাষাকে,

> গ্রামের মানুষের মুখের জবানকে, তিনি ঘষে মেজে, ঝকঝকে তীক্ষ্ণ ধারালো করে, আধুনিক জটিল চিন্তা প্রকাশের বাহন করে তাজ্জব বানিয়ে দিলেন। ভাষার এই বিস্ময়কর ভাস্কর আসলে বাংলা গদ্যের এক নতুন ঘরানার জনক। (রশীদ, ২০০৩ : ২৬)

সমরেশ বসুর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সখ্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে লেখকের স্মৃতিচারণে প্রতিফলিত।

আলোচ্য গ্রন্থে রশীদ করীম কেবল নিজের সম্পর্কে নানাভাবে বলেছেন তা নয়; অগ্রজদের সাহিত্যকর্মের সপ্রশংস বিশ্লেষণাত্মক মূল্যায়নও করেছেন। গ্রন্থের 'কথাসাহিত্য' অংশে লেখকের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যে সকল কথাসাহিত্যিকের উপন্যাস বা গল্প নিয়ে' আলোচনা করা হয়েছে তাঁরা হলেন আবু রুশদ[২], শওকত ওসমান, আবু ইসহাক, আহসান হাবীব, শহীদুল্লা কায়সার, হাসান আজিজুল হক, শওকত আলী, মাহমুদুল হক, হুমায়ূন আহমেদ ও আহমদ ছফা। এঁদের প্রধানত একটি করে উপন্যাস বা গল্প নিয়ে তিনি বিশদ আলোচনা করেছেন। লেখাই বাহুল্য, এ সকল আলোচনা সমালোচনার পরিধি ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। রশীদ করীম স্বদেশ ও স্বকালের পটভূমিতে রেখে রচনাকর্মগুলো অনুধাবন করতে চেয়েছেন এবং কখনো কখনো বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে সেগুলোর যোগসূত্র স্থাপনে অগ্রসর হয়েছেন। তিনি লেখকের ভাষা, ভঙ্গি, প্রবণতা নিয়েই কেবল প্রশ্ন উত্থাপন করেন নি, চরিত্রগুলোর আচরণ ও পরিণতি নিয়েও অভিমত উপস্থাপন করেছেন। 'অনুজের চোখে' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন অগ্রজদের সাহিত্যকর্মের গতিপ্রকৃতি। এ প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি সহোদর আবু রুশদের 'এলোমেলো'[৩] উপন্যাসের মূল্যায়ন করেছেন। আলোচ্য উপন্যাসের রাজনৈতিক দর্শন, সামাজিক অবস্থা ও উচ্চবিত্তের মনোবিকার লেখক বিশ্লেষণ করেছেন সযত্নে। বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের সংকট বিবেচনায় রেখে রশীদ করীম আবু রুশদের *এলোমেলো* উপন্যাসের বিচার করেছেন। সাহিত্যে যৌনতা প্রসঙ্গ তাঁর কাছে শিল্পিত সুষমায় গৃহীত হয়েছে। বাস্তবতার চেয়ে রোম্যান্টিকতা তাঁর বোধের জগতে গুরুত্ব পেয়েছে বেশি। তাই *এলোমেলো* উপন্যাসের দুটি চরিত্রের ভালোবাসায় যৌনতার কোনো তাগিদ তিনি অনুভব করেন নি। তাঁর মতে, সেখানে সেক্স থাকলেও তা ছিল 'য়্যাটলান্টিক মহাসাগরের মতো গভীর অবচেতনের একেবারে তলদেশে'। (রশিদ, ২০০৩ : ৩৬) অর্থাৎ রশীদ করীমের মানসে কামহীন প্রেম যতটা মর্যাদার আসনে, ততটা সকামপ্রেম নয়। কামবিবর্জিত প্রেমই তাঁর আরাধ্য। এ কারণে উপন্যাসের আলোচনায় কামবিবর্জিত প্রেমেরই অনুসন্ধান করেন তিনি। আবু রুশদের সাহিত্য সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

> আমাদের কথাসাহিত্যের উদ্বোধনে মাহবুব-উল-আলম, আবু রুশদ, শওকত ওসমান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ও আবুল কালাম শামসুদ্দিন (বর্তমানে শামসুদ্দিন আবুল কালাম) এবং শাহেদ আলী নিঃসন্দেহে একপঙ্‌ক্তিক। (রশিদ, ২০০৩ : ৩৯)

এঁরা কীভাবে একই পঙক্তিতে বসার যোগ্য— তার কোনো তুলনামূলক ব্যাখ্যা দেননি রশীদ করীম। ফলে তাঁর এই বক্তব্য কেবল মন্তব্য হিসেবে গ্রাহ্য ; বিশ্লেষণাত্মক মূল্যায়ন হিসেবে নয়। এ ধরনের মন্তব্য যুক্তিনিষ্ঠ পাঠকের কাছে মান্যতা পায় না। এটুকু বিশ্লেষণহীন মূল্যায়ন বাদ দিলে প্রবন্ধটি আবু রুশদের 'এলোমেলো' উপন্যাস পাঠের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

রশীদ করীম যেখানে আবু রুশদের উপন্যাসের সপ্রশংস আলোচনা করেছেন, সেখানে শওকত ওসমানের 'জননী' উপন্যাসের শিল্পমান নিয়ে দেখিয়েছেন প্রবল সংশয়। 'শওকত ওসমান-এর জননী' প্রবন্ধের শুরুতে মন্তব্য করেছেন, শওকত ওসমান এ উপন্যাসের ধারণা পেয়েছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পথের পাঁচালী* থেকে। আবার প্রবন্ধের সমাপ্তিতে দেখিয়েছেন, শওকত ওসমানের দৃশ্য সাজানোর ঘটনা কেবল বিকৃত রুচির বীভৎস রস পরিবেশনের কাজ করেছে। আসেকজান চরিত্র *পথের পাঁচালী*র ইন্দির-ঠাকরুণকে মনে করিয়ে দেবে বলেও মন্তব্য করেছেন। আলোচনার শুরুতেই তিনি জননীকে বলেছেন *পথের পাঁচালী*র প্রেরণাজাত, তাই শেষে এসে সে-যুক্তির পক্ষেই অটল থেকেছেন। প্রাবন্ধিক হিসেবে রশীদ করীম আগেই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত ছিলেন, *জননী* মৌলিক কল্পনাজাত নয়, অনুপ্রেরণাজাত। তাই নিজের সিদ্ধান্তের অনুকূলেই প্রবন্ধটি রচনা করেছেন। এক্ষেত্রে উপন্যাসের শিল্পরূপের চেয়ে, প্রাবন্ধিকের ব্যক্তিগত অভিরুচি ও পক্ষপাতই যেন গুরুত্ব পেয়েছে অধিক।

একই অভিরুচি ও অভিনিবেশ নিয়ে প্রাবন্ধিক রচনা করেছেন 'সমসাময়িকের চোখে : লালসালু', আবু ইসহাকের *সূর্য দীঘল বাড়ি নিয়ে* 'একটি বিখ্যাত উপন্যাস', আহসান হাবীবের *আরণ্য নীলিমা* উপন্যাস নিয়ে 'আহসান হাবীবের আরণ্য নীলিমা', 'শহীদুল্লা কায়সারের সারেং বৌ' শীর্ষক প্রবন্ধসমূহ। 'সমসাময়িকের চোখে : লালসালু' প্রবন্ধে লেখক *লালসালু* উপন্যাসের আকর্ষণীয় দিক সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেছেন— 'স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের রহস্য উন্মীলনে'। (রশীদ, ২০০৩ : ৪৮) শুধু তাই নয়, সমগ্র উপন্যাস জুড়েই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ নর-নারীর রহস্যময় সম্পর্কের উন্মোচনে 'তাঁর সূক্ষ্ম হাতের মিহি কাজ দেখিয়ে দিয়েছেন'। (রশীদ, ২০০৩ : ৪৮) সমগ্র প্রবন্ধটি *লালসালু* উপন্যাসের ব্যবচ্ছেদও বলা যেতে পারে। রশীদ করীমের অসাধারণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি উপন্যাসে ব্যবহৃত ক্ষুদ্র ত্রুটিসমূহ। এমনকি বক্ষ্যমাণ উপন্যাসের ভাষাশৈলী নিয়েও তিনি সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে :

> সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর কথকতার মধ্যে একটা 'মোমেন্টাম' আছে। কিন্তু তাঁর ভাষা আরো আধুনিক ও আরো ভালো হওয়া সম্ভব ছিল। সম্পূর্ণ অসূয়ামুক্ত এই উক্তি। কথাটা করজোড়ে বলে রাখলাম। কারণ প্রায়ই দেখেছি, মত একটা মতলব। (রশীদ, ২০০৩ : ৫২)

'একটি বিখ্যাত উপন্যাস' প্রবন্ধে আবু ইসহাকের *সূর্য দীঘল বাড়ি* উপন্যাসের প্রধান নারী-চরিত্র জয়গুনের সঙ্গে শওকত ওসমানের *জননী* উপন্যাসের দরিয়া বিবির সাদৃশ্য রয়েছে বলে রশীদ করীম উল্লেখ করেছেন। অন্যত্র তিনি আলোচ্য উপন্যাসের আর্থ-সামাজিক চিত্র উপস্থাপনে প্রধান নারী চরিত্রের সঙ্গে *সারেং বৌ* উপন্যাসের নবিতুনের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর মতে :

> দারিদ্র্যের যতই অসুবিধা থাকুক, দেখা যাচ্ছে যে, দারিদ্র্যের পীড়ন আমাদের নায়িকাদের দেহের আকর্ষণকে বাড়িয়ে দেয়। এরকমটি আমরা 'জননী'র দরিয়া বিবি, এবং 'সারেং বৌ'-এর নবিতুনের মধ্যেও দেখতে পেয়েছি। দারিদ্র্য তাদের শরীরে নতুন বসন্তের মঞ্জরী এনে দেয়। (রশীদ, ২০০৩ : ৬১)

প্রবন্ধের শেষে লেখক আবু ইসহাকের কাছে দুটি প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেছেন যে, জয়গুন ছাড়া আর কোনো চরিত্রের মধ্যে তিনি 'ভালো'র বৈশিষ্ট্য দেখতে পাননি কেন এবং পীর-ফকির হলেই তাকে ভণ্ড হতে হবে কেন?— এই জিজ্ঞাসা প্রাবন্ধিক রশীদ করীমের যতটা, ঠিক ততটাই সমালোচক রশীদ করীমেরও। লেখকের উদ্দেশে অমোঘ প্রশ্ন ছুড়ে দেওয়া যেন তাঁর প্রাবন্ধিক সত্তার বিশেষ দিক। মনের জিজ্ঞাসা তিনি মনে রাখেন না, সরাসরি অকপটে তা প্রকাশ করেন। এই প্রকাশভঙ্গিই তাঁর প্রাবন্ধিক পরিচয়কে বহুলাংশে ছাপিয়ে গেছে। 'আহসান হাবীবের 'আরণ্য নীলিমা' শীর্ষক রচনায় রশীদ করীম কবিতা ও উপন্যাসের মূল পার্থক্য নির্দেশ করে কবি আহসান হাবীবের *আরণ্য নীলিমা* উপন্যাসের ভিন্ন দিক নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন। বক্ষ্যমাণ উপন্যাসটিকে তিনি বলেছেন, 'সে অর্থে উপন্যাস নয় ; উপন্যাসের ব্যাপ্তি ও প্রসার এ রচনাটিতে নেই'। (রশীদ, ২০০৩ : ৬৫)' এরকম সরস সমালোচনা রশীদ করীম করলেও তা নিছক লেখকের উক্ত গ্রন্থের মূল্যায়নে কশাঘাত করেনি। উপন্যাসটির ভাষায় গীতময়তা রয়েছে বলে তা পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে 'আহসান হাবীবের ভাষার মধ্যেও নিম্নকণ্ঠের এক লাজনম্রতা অথবা লাজনম্রতার নিম্নকণ্ঠও বলতে পারেন আছে, যা কাহিনী কথিকার উপযোগীই হয়েছে'। (রশীদ, ২০০৩ : ৬৭) প্রবন্ধের শেষাংশে এসে তিনি *আরণ্য নীলিমাকে* 'আমাদের সাহিত্যের একটি মূল্যবান সংযোজন' (রশীদ, ২০০৩ : ৬৮) হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। তবে প্রবন্ধকার উপন্যাসটির উচ্চ কলাগুণকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকাশ করতে ততটা কৃতিত্বের পরিচয় দিতে না পারলেও উপলব্ধি করতে যে সমর্থ হয়েছিলেন তার প্রমাণ সহজেই অনুমেয়।

'শহীদুল্লা কায়সারের সারেং বৌ' প্রবন্ধে লেখক *সারেং বৌ* উপন্যাসের আদ্যন্ত পর্যালোচনা করেছেন। আলোচ্য উপন্যাসের প্রায় সকল চরিত্র নিয়ে তিনি বিস্তর আলোচনা করেছেন। এছাড়া পারিপার্শ্বিক চিত্র যেমন ঝড়, বৃষ্টি, বন্যার যে দৃশ্য উপন্যাসটিতে প্রযুক্ত হয়েছে তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন রশীদ করীম। তাঁর মতে :

> ঝড় বৃষ্টি বিদ্যুৎ ও বন্যার যে সুদীর্ঘ বর্ণনাটা আছে তা বাংলা সাহিত্যের এক দুর্লভ সম্পদ। ঈর্ষণীয় কৃতিত্বের সঙ্গে শহীদুল্লা কায়সার বিপর্যয়ের ছবিটা এঁকেছেন। এতোটা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ পারেননি। (রশীদ, ২০০৩ : ৭৪)

কিছু ভুল-ত্রুটি বাদ দিলে *সারেং বৌ* যে শহীদুল্লা কায়সারের একটি শিল্পসফল উপন্যাস তা প্রাবন্ধিক রশীদ করীম প্রবন্ধের শেষে তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বলার প্রয়াস পেয়েছেন :

> নাবিক হিসেবে সমুদ্রে আর বন্দরে কদমের অভিজ্ঞতাগুলোকে গণ্য না করেলে, সারেং বৌ নিঃসন্দেহে একটি অসামান্য উপন্যাস। এবং নবিতুনের মতো একটি চরিত্র যিনি সৃষ্টি করতে পারেন তিনি তাঁর সৃষ্টিকর্মের শেষে, একটি তৃপ্তির হাসি হাসতে পারেন। (রশীদ, ২০০৩ : ৭৫)

প্রাবন্ধিক রশীদ করীম অগ্রজদের পাশাপাশি সমসাময়িক ও অনুজদের সাহিত্যকর্ম নিয়েও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। 'হাসান আজিজুল হকের গল্প' প্রবন্ধে রশীদ করীম ব্যক্তি আজিজুল হকের স্বভাবের বৈপরীত্যে লেখক আজিজুল হকের অবস্থান বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর ভাষায় :

> হাসান আজিজুল হক লোকটি যেমন সহাস্য, রহস্য ও কৌতুকপ্রিয়, সদালাপী, খোশমেজাজী, তাঁর লেখা কিন্তু সবসময় সে রকম নয়; বরং প্রায়ই অত্যন্ত প্রতিজ্ঞ সঙ্ঘবদ্ধ ও নিষ্করুণভাবে সর্বহর্ষ লোপনকারী। কথায় আড্ডায় তিনি যে হাসিতামাশার পরিচয় দেন, লেখায় সেরকম প্রশ্রয় পায় না, কারণ তিনি লেখেন, জীবনটাকে তিনি যেভাবে দেখেন সেই সম্পর্কে এবং বলাবহুল্য জীবনে মাঝে-মধ্যে হাসিতামাসার স্থান থাকলেও, জীবন জিনিসটা একটা ইয়ার্কি নয়। (রশিদ, ২০০৩ : ৭৬)

জীবনকে 'শুভ ও অশুভের একটা লড়াই হিসেবে' পর্যবেক্ষণ করলেও হাসানের লেখায় 'অশুভের পরাক্রমটাই' অধিক ক্রিয়াশীল বলে মনে করেছেন প্রাবন্ধিক। এ প্রসঙ্গে তিনি লেখকের *আমৃত্যু আজীবন* গল্পের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যেখানে 'একটি গোক্ষুর অশুভর, অশুভ কিন্তু মাঝে মাঝে অতি মোহন; একটি বিল কখনো শুভ কখনো অশুভর; এবং বজ্র কটকটে শাদা এবং তীব্র ও ঝাঁঝালো মৃত্যুর প্রতীক হয়ে উপস্থিত হয়েছে'। (রশীদ, ২০০৩ : ৭৬) জীবনকে যেভাবে অবলোকন করেছেন হাসান ঠিক একইরকমভাবে তাঁর লেখায় প্রকৃতির বহুবর্ণিল উদ্ভাসন লক্ষ করা যায়। তাঁর রচনায় নিসর্গ যে নিছক কাহিনি বর্ণনার নিরিখে কিংবা চরিত্রের আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়নি তারও সমালোচনা করেছেন রশীদ করীম। তাঁর মতে :

> নিসর্গকে হাসান কখনো জীবনের কখনো মৃত্যুর প্রতীক হিসেবে- এবং সর্বদাই পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করেছেন। প্রাকৃতিক বর্ণনা অন্য লেখকদের মধ্যেও আমরা দেখেছি কাহিনীর পাদ- পূরণের জন্য তা এসেছে, এসেছে একটা রেওয়াজের মতো, কিন্তু কাহিনীতে একটা ভূমিকা পালনের জন্য, কিংবা কাহিনীর পাত্রপাত্রীর মর্যাদা নিয়ে তা কখনো এসেছে বলে আমি এক্ষুণি মনে করতে পারছি না। যেমন দেখতে পাই হাসান আজিজুল হকের লেখায়। যে প্রাকৃতিক বর্ণনা তিনি দেন, তা গতানুগতিক নয়। একটি মানব চরিত্রের সবগুলো বৈশিষ্ট্য তিনি লক্ষ করেন, প্রকৃতিরও তাই এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যকে তিনি মানবজীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশিয়ে দেন। (রশীদ, ২০০৩ : ৭৮)

প্রাবন্ধিক রশীদ করীম হাসান আজিজুল হকের ভাষাভঙ্গিরও ইতিবাচক মূল্যায়ন করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

> ভাষা ব্যবহারে হাসান আজিজুল হকের কুশলতা বিখ্যাত। তাঁর ভাষার এক চুম্বকী সম্মোহনী শক্তি আছে। কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়েছে, তাঁর ভাষা হুড়মুড় করে মাথার ওপর এসে পড়ে। বাক্যের অর্থ এবং চিন্তার পরিণতি অনুসরণ করতে মাঝে মাঝে কষ্ট হয়। কিন্তু পাঠকের কাছে লেখক এই মনোযোগ দাবি করতেই পারেন। (রশীদ, ২০০৩ : ৮০)

মাহমুদুল হকের *জীবন আমার বোন* উপন্যাস সম্পর্কে রশীদ করীমের আলোচনা অনেকটা নির্মোহ হলেও ইতিবাচক। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের 'মাহমুদুল হকের উপন্যাস' শীর্ষক প্রবন্ধে রশীদ করীম উক্ত উপন্যাস পাঠ করে এই ধারণায় উপনীত হয়েছেন যে 'পুনর্বার প্রমাণ পেলাম, চিনতে আমার ভুল হয়নি, সত্যই একজন শক্তিশালী লেখকের আবির্ভাব ঘটেছে, আমাদের মধ্যে'। (রশীদ, ২০০৩ : ৮৮) আলোচ্য উপন্যাস নিয়ে প্রাবন্ধিক শব ব্যবচ্ছেদ না করলেও লেখকের চরিত্র-চিত্রণগত দিক সম্পর্কে 'আরও একটু মনোযোগ দিতে হবে' (রশীদ, ২০০৩ : ৮৮) বলে মন্তব্য করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন :

> উপন্যাসে বেলী নামে আর একটি চরিত্র আছে— সে যে উপন্যাসে কেন এল আর গেল, আমি বুঝতে পারি নি.... তেমনি, মুরাদের সেই ভগ্নি, যার সম্পর্কে বন্ধু-বান্ধবরা ছড়া কাটে, যিনি ক্লাবে যান, সুরা পান করেন, অনেক রাত করে বাড়ি ফেরেন। এই চরিত্রটিরই-বা কি প্রয়োজন ছিল? এই রকম কিছু কিছু চরিত্র আছে, এমনকি সংলাপ, আলোচনা, আর ঘটনা যা উপন্যাসটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোনো কাজ করে বলে আমার ঠিক মনে হয়নি। (রশীদ, ২০০৩ : ৯০)

'আরো দুটি উপন্যাস' শীর্ষক প্রবন্ধে রশীদ করীম হুমায়ূন আহমেদের *শঙ্খনীল কারাগার* এবং শওকত আলীর *অপেক্ষা* উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনাসূত্রে তাঁদের শিল্পী-স্বভাবের বিশেষ কিছু প্রবণতা নির্দেশ করেছেন। হুমায়ূন আহমেদ সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন এরূপ :

> হুমায়ূন একটি ছোট্ট ভুবন বেছে নেন এবং সেই জগতের অধিবাসীদের কথা তিনি সহজ সংযত ভাষায় উপস্থিত করেন। তাঁর লেখায় সমাজকেও দেখতে পাই কিন্তু একটি পরিবারের অন্দরমহলে যে পরিমাণ সমাজ জায়গা পেতে পারে, ততোটাই। তাঁর উপন্যাসে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সর্বজনীন হয়ে ওঠে না। (রশীদ, ২০০৩ : ৮১)

প্রাবন্ধিক রশীদ করীমের এই সরস বক্তব্য ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদের *শঙ্খনীল কারাগার* উপন্যাস সম্পর্কেও সমানভাবে প্রযোজ্য। আলোচ্য উপন্যাসের প্রধান চরিত্র রাবেয়ার অর্ন্তদ্বন্দ্ব ও ক্ষরণ কেবল ব্যক্তিক জীবনাভিজ্ঞতায় সীমাবদ্ধ থেকেছে, সর্বজনীন হয়ে ওঠেনি। রশীদ করীম শওকত আলীর *অপেক্ষা* উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্র নিয়ে বিস্তৃত সমালোচনা করেছেন প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশে। বিশেষ করে উপন্যাসের নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্কের যে চিত্র শওকত আলী অঙ্কন করেছেন তার দিকেই যেন প্রাবন্ধিক রশীদ করীমের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে। পাশাপাশি উপন্যাসে প্রতিফলিত বেশ কিছু ত্রুটি তাঁর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তিতে চিহ্নিত হয়েছে প্রবন্ধের শেষাংশে। তাঁর মতে :

> তাহলে 'অপেক্ষা'টা কিসের জন্য? মানসিক দিক দিয়ে নাবালক নায়ক কতদিনে বিয়ের জন্য মানসিক প্রস্তুতি লাভ করবে— তার? তার মানসিকতার কোনো অপ্রস্তুত অবস্থা তো আমরা দেখিনি? তাহলে কি— যদিও লেখক সে কথা বলেননি— কতোদিনে একটি আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তি সুখী হবে কেবল তখনই— আমাদের নায়কও সুখী হওয়ার অধিকার লাভ করবে সেই দিনটির? (রশীদ, ২০০৩ : ৮৭)

'পাঠ করে প্রীত হলাম' শীর্ষক রচনায় অনুজ আহমদ ছফার *ওঙ্কার* উপন্যাস সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের মূলায়ন ইতিবাচক। তাঁর ইতিবাচক মূল্যায়ন *ওঙ্কার* উপন্যাস পাঠে যেকোনো পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমালোচক মোহাম্মদ নূরুল হক বলেছেন :

> আহমদ ছফার 'ওঙ্কার' পাঠ করে রশীদ করীম যে কী মুগ্ধ হয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'পাঠ করে প্রীত হলাম' প্রবন্ধটি পড়লে। এরকম সরস সমালোচনা উক্ত উপন্যাসকে একটি ভিন্ন মাত্রা এনে দেয় নিঃসন্দেহে। আর প্রাবন্ধিক রশীদ করীমের দৃষ্টিভঙ্গিও কত স্বচ্ছ। উপন্যাসটি পাঠ করে তিনি যে সত্যিই প্রীত হয়েছিলেন এবং ভবিষ্যৎ পাঠককুলের জন্য এ উপন্যাস যে এক মাইলফলক হতে পারে তা প্রবন্ধ পাঠে বোঝা যায়। (নূরুল, ২০১১ : ৪০)

ওঙ্কার নামটি উপন্যাসের ক্ষেত্রে যথাযথ হয়েছে চিহ্নিত করে রশীদ করীম বলেছেন :

> এ উপন্যাস মনে রাখার মত। এ উপন্যাসেরই একটি আলোচনায় যেটি গ্রন্থটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে— সেখানে বলা হয়েছে, 'হিন্দু পুরাণ মতে 'ওঙ্কার' হচ্ছে আদি ধ্বনি, সকল ধ্বনির মূল'। সুতরাং উপন্যাসটির নাম এর চাইতে ভালো আর কিছু হতে পারতো না। (রশীদ, ২০০৩ : ৯৬)

কেবল নামকরণ নয়, উপন্যাসটির ভাষারীতি ও শব্দ নির্বাচনে ছফার অসাধারণত্বেরও প্রশংসা করেছেন প্রাবন্ধিক। তাঁর মতে :

> 'ওঙ্কার' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমি প্রায়ই লেখকের নিজের ভাষারই আশ্রয় নেবো। রীতিটা আলোচনার সহায়ক : তাছাড়া পাঠক বুঝতে পারেন, আহমদ ছফার এক একটি শব্দ কী রকম শিলাখণ্ডের মত কঠিন হতে পারে, হতে পারে আপাত উদাসীন-নির্মম, অথচ তারই অন্তরে কি পরিমাণ গভীর বেদনা ও ভালোবাসা নিমীলিত হয়ে আছে। (রশীদ, ২০০৩ : ৯৩)

সমালোচনামূলক প্রবন্ধের পাশাপাশি রশীদ করীম আলোচ্য গ্রন্থের এ অংশেই অন্তর্ভুক্ত করেছেন একটি তাত্ত্বিক প্রবন্ধ। 'সাহিত্যে সেন্টিমেন্টালিজম' শীর্ষক এ প্রবন্ধের মূল বিষয় শিরোনামাতেই উৎকীর্ণ। এখানে রশীদ করীমের বক্তব্য হল সাহিত্যে সেন্টিমেন্টালিজমের জন্য হৃদয়াবেগ নয় বরং লেখকের অক্ষমতাই বহুলাংশে দায়ী। এ প্রসঙ্গে তিনি শরৎচন্দ্র এবং ডিকেন্সের সাহিত্যে চরিত্র-সৃষ্টি সম্পর্কে দৃষ্টান্ত দিয়ে উল্লেখ করেছেন :

> বাংলা সাহিত্যে হৃদয়বৃত্তির প্রাধান্য বেশি তাতে অবশ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই কারণে হৃদয়বৃত্তির সাহিত্য সৎ-সাহিত্য হয় নি এ ধারণা ঠিক নয় । যেসব রচনা সাহিত্য হয়নি, তার কারণ ভিন্ন— শরৎচন্দ্র বা ডিকেন্স তাঁদের স্বাভাবিক প্রবণতার লাগাম টেনে ধরলে শেষ পর্যন্ত কোনো রকম সাহিত্যই সৃষ্টি করতে পারতেন কি না সন্দেহ। শরৎচন্দ্র বা ডিকেন্স কেউই intellectual চরিত্র সৃষ্টি করতে পারেন নি— অর্থাৎ সৃষ্টি সার্থক হয়নি। সুতরাং ভাবাবেগপূর্ণ চরিত্র সৃষ্টি থেকে তাঁরা বিরত হলে সাহিত্যের লোকসানই হতো। (রশীদ, ২০০৩ : ১০২)

এ প্রবন্ধে লেখক সাহিত্যে সেন্টিমেন্টালিজম সম্পর্কে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও আবুল হোসেনের মতামতকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, 'সেন্টিমেন্টালিজম সম্বন্ধে এদের ধারণাও আমার কাছে শাস্ত্রসম্মত মনে হয়নি'। (রশীদ, ২০০৩ : ৯৭) অর্থাৎ তিনি ভিন্ন মত পোষণ করেন কি না তা ব্যাখ্যা না করে প্রথমে এ দুজনের মত অস্বীকার করেছেন। পরবর্তী পর্যায়ে প্রাবন্ধিক বিভিন্ন সাহিত্যিকের রচিত সাহিত্যকর্মের দৃষ্টান্ত দিয়ে তাঁর নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেছেন। প্রবন্ধটি পাঠ শেষে পাঠকের মনে হতে পারে, রশীদ করীম সাহিত্যে যত জন তত মতে বিশ্বাসী নন।

কবিতা সে-অর্থে না লিখলেও রশীদ করীম কবিতা-সম্পর্কিত আলোচনায় স্বতঃস্ফূর্ত ও সাবলীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় রেখেছেন। আলোচ্য গ্রন্থের 'কবিতা' ও 'রুঠা ভাষার কবি' শীর্ষক অংশযুগলে তাঁর কাব্য সম্পর্কিত আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রথম অংশে রবীন্দ্রনাথের অমর সৃষ্টি *শ্যামা* এবং *চণ্ডালিকা* নিয়ে দুটি মূল্যবান প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। 'ন্যায়-অন্যায় জানিনে জানিনে জানিনে' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য *শ্যামা* সম্পর্কিত

লেখকের বুদ্ধিদীপ্ত, যুক্তিনিষ্ঠ সমালোচনা স্থান পেয়েছে। শ্যামা নাটকের চরিত্রায়ণ কৌশল সম্পর্কে রশীদ করীম বলেছেন :

> 'শ্যামা' নাটকের প্রধান চরিত্র তিন শ্যামা এবং উত্তীয় ও বজ্রসেন। যদিও বজ্রসেনই নাটকের নায়ক; কিন্তু সেই সর্বাপেক্ষা নিষ্প্রভ চরিত্র। ওর মতো লোককেই ইংরেজিতে nincompoop বলে। সত্যই, তাকে দু'চক্ষে দেখতে ইচ্ছে করে না। (রশীদ, ২০০৩ : ১০৪)

এ রকম সরস সমালোচনা প্রাবন্ধিক রশীদ করীমের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচায়ক। এ রচনায় তিনি আবু সয়ীদ আইয়ুবের *পান্থজনের সখা* গ্রন্থের 'এ দুর্লভ প্রেম' শীর্ষক প্রবন্ধে 'শ্যামা' সম্পর্কিত যে বাঙ্ময় আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তারও বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, 'আইয়ুবের দরদি মন ও অন্তর্ভেদী দৃষ্টির পরিচয় তাঁর প্রবন্ধটির আগাগোড়া সর্বত্র ছড়িয়ে আছে'। (রশীদ, ২০০৩ : ১০৭) পাশাপাশি আইয়ুবের মতামতের ক্ষেত্রে প্রাবন্ধিক কোনো কোনো স্থানে দ্বিমত পোষণ করেছেন। প্রবন্ধের শেষে তাঁর দ্বিমত পোষণের নমুনাংশ এ পর্যায়ে নির্দেশ করা যেতে পারে :

> শ্যামার পাপের extenuating দিকগুলোর কথা আইয়ুব ভালো করেই বলেছেন, কিন্তু কোনো রায় দেননি — বরং পাল্টা প্রশ্ন করেছেন, শ্যামার পাপ 'একেবারে অমার্জনীয় কি'? নিজেকে commit করেননি। কিন্তু পাপের প্রশ্ন উঠলে রায় দিতেই হবে। ব্যাপারটাকে 'আলো-আঁধারি'তে ছেড়ে দিলে চলবে না। (রশীদ, ২০০৩ : ১১১)

'যে মানব আমি সে মানব তুমি' শীর্ষক প্রবন্ধে রশীদ করীম রবীন্দ্রনাথের আরেক গীতিনাট্য *চণ্ডালিকা* সম্পর্কে তাঁর মতামত উপস্থাপন করেছেন। আলোচ্য নাটক সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'আসলে অন্তত প্রধানত 'চণ্ডালিকা' বর্ণ-বৈষম্যের নাটক'। (রশীদ, ২০০৩ : ১২০) নাটকের প্রধান নারী চরিত্র প্রকৃতি সমাজের দৃষ্টিতে অন্ত্যজ শ্রেণিভুক্ত হলেও তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ অত্যন্ত প্রখর বলে প্রাবন্ধিক মনে করেন। এ প্রবন্ধেও রশীদ করীম আবু সয়ীদ আইয়ুবের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে :

> আবু সয়ীদ আইয়ুবের রবীন্দ্রচর্চা এক পরমাশ্চর্য সাহিত্য-কীর্তি। রবীন্দ্রনাথের গভীরে প্রবেশ করার জন্য তিনি আমাদের অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে গেছেন। অবশ্য তাঁর কিছু কিছু মন্তব্যে যে জিনিসটা পরিষ্কার হয়েই ছিল সেখানে কিছুটা কুহেলিকাও তৈরি করে দেয়। (রশীদ, ২০০৩ : ১১৬)

'চণ্ডালিকা' সম্পর্কিত আলোচনায় আবু সয়ীদ আইয়ুবের সকল মতামত রশীদ করীম আলোচ্য প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করেছেন। সেখানে সয়ীদের বিভিন্ন বিশ্লেষণ যে প্রাবন্ধিকের দৃষ্টিতে ইতিবাচক তা নয়; কোনো কোনো ক্ষেত্রে রশীদ করীম তাঁর মতামতের বিরোধিতাও করেছেন। দৃষ্টান্ত :

> ক. আইয়ুব তাঁর আলোচনা শুরু করেছেন এই বলে : 'চণ্ডাল কন্যা প্রকৃতির রঙ কালো হলে কি হবে, দেখতে বড় সুন্দর। শুধু দেহের নয়, মনের গড়নও তার আর পাঁচ জনের মতন নয়; সাধারণ মেয়ের পর্যায়ে তাকে কিছুতেই ফেলা যায় না...।'
>
> প্রকৃতি মনের গড়নের দিক দিয়ে অসামান্যা (নহি আমি সামান্যা নারী) এই খবরটি আইয়ুব পেলেন কোথায় ? 'চণ্ডালিকা'য় তো সে সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। (রশীদ, ২০০৩ : ১১৭)
>
> খ. আবু সয়ীদ আইয়ুব তাঁর প্রবন্ধের শেষে পাদটীকায় বলেছেন: 'এ আলোচনা 'চণ্ডালিকা' গদ্যনাট্য ও গীতিনাট্য....উভয়ের ওপর আশ্রিত'।

যে পাঠক শুধু গীতিনাট্য সামনে রেখে আলোচনাটি পাঠ করবেন তাঁরা আইয়ুবের কোনো কোনো উক্তিতে খুবই অবাক হবেন, বিশেষ করে এই কারণে যে গদ্যনাট্য ও গীতিনাট্য interpretation-এর মধ্যে কোনো বিরোধ থাকলে সে কথা আইয়ুব বলেননি। বরং এমনভাবে আলোচনা করে গেছেন যেন একটি আর একটির সহায়ক ও পরিপূরক। (রশীদ, ২০০৩ : ১২২)

সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির অধিকারী প্রাবন্ধিক রশীদ করীম এভাবেই বিভিন্ন সাহিত্যিকের বিশ্লেষণধর্মী মতামতকে যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করেছেন।

বাংলাদেশের দুই বিশিষ্ট কবি আবুল হোসেন এবং শামসুর রাহমানকে নিয়ে রশীদ করীম রচনা করেছেন দুটি ভিন্ন ধারার প্রবন্ধ। 'রুঠা ভাষার কবি' শীর্ষক অংশের প্রথম রচনা 'কবিতার গণ্ডে লাবণ্য চাই' কবি আবুল হোসেনের কবিকৃতির সমগ্রতা বলা যায়। প্রথমেই রশীদ করীম আবুল হোসেনের কবিতার ভাষা সম্পর্কে আলোকপাত করে উল্লেখ করেছেন :

> তাঁর কবিতার 'ভাষার নিরাভরণ রূপ ও অল্পকথন বিধবার পোশাকের মতো আড়ম্বরহীন... তাঁর কবিতায় দু'রকম বৈধব্য আছে, পোশাকের এবং আবেগের। ... কিন্তু আবুল হোসেনের কবিতায় আমরা আরো বৈচিত্র্য দেখতে পাই। সেই সোস্যাল বা পলিটিক্যাল স্যাটায়ার, বারবার পরিবেশন করলে — একটু ফিকে লাগতে বাধ্য। (রশীদ, ২০০৩ : ১২৬)

এরপর প্রাবন্ধিক আবুল হোসেনের কয়েকটি নির্বাচিত কবিতার ভাষাশৈলী নিয়ে তাঁর বিশ্লেষণধর্মী মতামত উপস্থাপন করেছেন। এসব বিশ্লেষণ একজন কবিতা সমালোচকের মতামতকেও ছাড়িয়ে গেছে অনেকাংশে।

'শামসুর রাহমানের কবিতা' শীর্ষক প্রবন্ধে রশীদ করীম কবির কবিতার বিষয় ও আঙ্গিক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা তুলে ধরেছেন। শামসুর রাহমানের কবিতায় কথোপকথনধর্মিতা সম্পর্কে প্রাবন্ধিক বলেছেন :

> শামসুর রাহমানের কবিতা পাঠ করলে মনে হয় মুখোমুখি চেয়ারে বসে যেন তিনি কথা বলে যাচ্ছেন। আমি বলি কবিতা অনেকেই লেখেন, কিন্তু সকলের লেখাতেই কথোপকথনের এই অনুষঙ্গ ঠিক সেভাবে আসেনা। (রশীদ, ২০০৩ : ১৩২)

কবিতার বিষয়গত বৈচিত্র্য শামসুর রাহমানের কবিতাকে নান্দনিক করে তুলেছে বলে রশীদ করীম মনে করেন। তাঁর মতে :

> নিঃসঙ্গতা, রূপতৃষ্ণা, দেশপ্রেম, প্রেম, কাব্য তৈরির জন্য অস্থিরতা, এবং নস্টালজিয়া, মোটামুটি বোধ করি এই হলো শামসুর রাহমানের কবিতার বিষয়বস্তু। (রশীদ, ২০০৩ : ১৪১)

তবে প্রেমের কবিতাই যে শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ স্মারক তা প্রাবন্ধিক নির্দেশ করেছেন তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিমায় :

> শামসুর রাহমানের কবিতায় অবসাদ আছে, আছে নিঃসঙ্গতা, কখনো বা মৃত্যুচিন্তা জীবনকে ঊষর অর্থহীন করে দেয়, কিন্তু একটি জিনিস তাঁর জীবনকে অর্থময় করে তুলতে কখনো ব্যর্থ হয় না। এবং তা হচ্ছে প্রেম। এবং আমার বিবেচনায় শামসুর রাহমানের প্রেমের কবিতাগুলোই তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা। বোধ করি বিষ্ণু দেও এক পুস্তক সমালোচনায় বলেছিলেন, 'নাস্তির' চাইতে 'অস্তির' বর্ণনাতেই শামসুর রাহমানের কৃতিত্ব বেশি। (রশীদ, ২০০৩ : ১৩৯)

শামসুর রাহমানের কবিতা জনপ্রিয়তার মূলে প্রাবন্ধিক বেশ কিছু বিষয়কে নির্দেশ করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে প্রবল সমসাময়িকতা, অতি নিকট পরিবেশ ; বিশেষ করে পুরনো ঢাকার জীবন ও সংস্কৃতিচিত্র — যেখানে তিনি বহু সময় কাটিয়েছেন, অতি তুচ্ছ বিষয় যেমন : কাক, কুকুর, গিরগিটি, জুতোর গহ্বর, পলেস্তারা খসে যাওয়া দেওয়াল প্রভৃতি। প্রবন্ধের শেষে প্রাবন্ধিক শামসুর রাহমান সম্পর্কে বলেছেন :

> আমার বিবেচনায় শামসুর রাহমানের আসল সত্তাকে, The essential Shamsur Rahman-কে খুঁজে পেতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে তাঁর সেই প্রথম সাড়া জাগানো কবিতা 'রূপালি স্নান'-এর কাছে।-- অবশ্য একজন সৃজনশীল কবি, যিনি নিত্য নতুন সৃষ্টিকর্ম উপহার দিয়েই চলেছেন, তাঁর সম্পর্কে বক্তব্য, একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। শুধু এটুকুই নির্দ্বিধায় বলা যায়, শামসুর রাহমান আমাদের কবিতায় নতুন রক্ত-সঞ্চার করেছেন। (রশীদ, ২০০৩ : ১৫৪)

বাংলাদেশের এই বিশিষ্ট কবি সম্পর্কে রশীদ করীম যে মতামত তুলে ধরেছেন তা কবি শামসুর রাহমানের কবিস্বভাবের মৌল প্রবণতাকেই নির্দেশ করে।

আবু সয়ীদ আইয়ুব-পত্নী গৌরী আইয়ুবকে প্রীতি ও শুভেচ্ছাসহ উৎসর্গীকৃত *অতীত হয় নূতন পুনরায়* রশীদ করীমের দ্বিতীয় প্রবন্ধগ্রন্থ। গ্রন্থের ভূমিকা-অংশে প্রাবন্ধিক এর পরিচিতি তুলে ধরে বলেছেন :

> এই সঙ্কলনে নানাবিধ লেখা আছে। বিষয়ের দিক দিয়ে একটি লেখার সঙ্গে আর একটি লেখার সঙ্গতি খুব কম ক্ষেত্রেই রক্ষিত হয়েছে। তাই, এই বইটিকে একটি বিচিত্রাও বলা যেতে পারে।
>
> এই সুযোগে সাহিত্যের পথে আমাদের সতীর্থ সেলিনা হোসেন এবং শামসুজ্জামান খানকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে রাখি। তাঁদের সহিষ্ণুতা ও উদার সহযোগিতা ছাড়া এই বইটি অন্তত এই সময়ে প্রকাশিত হতে পারত না। (রশীদ, ২০০৩ : ১৫৬)

বিচিত্রধর্মী এ গ্রন্থে লেখক চারটি অংশে মোট উনচল্লিশটি প্রবন্ধ স্থান দিয়েছেন। এর প্রথম অংশে 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' শিরোনামায় অন্তর্ভুক্ত আঠারোটি রচনায় রশীদ করীম সমকালীন সাহিত্য ও সংস্কৃতি-সংক্রান্ত বিশ্লেষণধর্মী মতামত উপস্থাপন করেছেন। মধ্য-আশিতে রচিত এ গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ *উপন্যাসে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক* দীর্ঘ আকৃতির হলেও এতে প্রাবন্ধিক উপন্যাসের অন্ধিসন্ধিতে আলো ফেলে নর-নারীর সরল ও জটিল সম্পর্কের স্বরূপ সন্ধান করেছেন। এ সূত্রেই তিনি প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য সাহিত্যের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত তুলে এনে উপন্যাসে নারী-পুরুষের সম্পর্কের জটিল প্রান্তকে অন্বেষণ করতে ব্রতী হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি', 'চোখের বালি', 'ঘরে বাইরে' প্রভৃতি উপন্যাসে নর-নারীর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে তিনি ইতিবাচক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি। ফলত

বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকদের রচিত জনপ্রিয় কিছু উপন্যাস নিয়ে তিনি এ বিষয়ে অনুসন্ধান চালিয়েছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কৌতুক করতেও দ্বিধা করেননি। শওকত ওসমানের 'জননী' উপন্যাসের দরিয়া বিবি সম্পর্কে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তাতে তাঁর স্নিগ্ধ কৌতুকবোধের পরিচয় পাওয়া যায় :

> শওকত ওসমানের 'জননী'র নায়িকা দরিয়া বিবিও নায়িকা হওয়ার যোগ্য পাত্রী। তিনিও তাঁর শরীরটিকে এক দুর্জয় ঘাঁটি বানিয়ে রেখেছেন। দুনিয়া ভেসে যাক, তবু ঐ একটা জিনিস ? উঁহু, জান থাকতে নয়। তাঁকেও অনাহারে থাকতে হয়। তবু তাঁর শরীরটাও যৌবনে টইটুম্বুর, যদিও তাঁর একাধিক সন্তান আছে এবং বর্তমানে তিনি দ্বিতীয় স্বামীর ঘর করছেন এবং কোনো স্বামী তাঁর যৌবনকে হেলায় পড়ে থাকতে দেননি। বছরের পর বছর ভুখা-পেটে থাকলেই যে মেয়েদের যৌবন উথলে উঠে, এই খবরটি শুধু আমাদের উপন্যাসেই পাওয়া যায়। (রশীদ, ২০০৩ : ১৬১)

বাংলা সাহিত্যের অপর শ্রেষ্ঠ কবি কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে রশীদ করীম লিখেছেন 'অতীত হয় নূতন পুনরায়' শীর্ষক বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের নামপ্রবন্ধটি। এখানে বিশেষত তিনি বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ শান্তিদেব ঘোষ এবং সাহিত্য-সমালোচক বুদ্ধদেব বসুর নজরুল সম্পর্কিত মূল্যায়ন নিয়ে তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণ প্রদান করেছেন। প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসুর মূল্যায়নকে প্রশংসা করে বলেছেন, 'বৈদগ্ধ্যে শান্তিদেব ঘোষের অনেক ওপরে তাঁর (বুদ্ধদেব) স্থান'। (রশীদ, ২০০৩ : ১৭৫) নজরুল জাতীয় জাগরণের কবি বলেই তাঁকে জাতীয় কবি অভিধায় চিহ্নিত করে যে বাঙালি গৌরব বোধ করে তার অন্তরালে যে সত্য অপ্রচ্ছন্ন থেকে গেছে তারও উল্লেখ করেছেন প্রাবন্ধিক। তাঁর মতে :

> আমরা নজরুল ইসলামকে জাতীয় কবি বলি। তাঁকে কি ভেবে চিন্তেই এই আসনে বসিয়েছি? কিংবা আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে রবীন্দ্রনাথের একজন প্রতিযোগী দাঁড় করাবার জন্যই এই কাজটি করেছি? আমরা কি মনে রেখেছি যে নজরুল 'কালী'কে নিয়েও বহু গান রচনা করেছেন? সেটা স্বীকার করেই কি তাঁকে তাঁর যোগ্য মর্যাদার আসনে বসিয়েছি? কিংবা আমাদের মনে নজরুলের একটি পরিমার্জিত সংস্করণ আছে? 'কালী'কে নিয়ে গান লিখেছেন, এক হিন্দু মহিলাকে বিয়ে করেছেন, ছেলেদের বাংলা নাম রেখেছেন— এই সব কারণে নজরুলকে 'কাফের' বলা হয়েছে সে কথা আমরা ভুলে যাইনি। যাই নি কেন? সব জেনে শুনেই আমরা তাঁকে জাতীয় কবি বলেছি? (রশীদ, ২০০৩ : ১৭৬)

বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যকৃতি নিয়ে রশীদ করীম রচনা করেছেন 'শ্রী বুদ্ধদেব বসু ও ঢাকা' শীর্ষক প্রবন্ধ। বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় এবং কথাসাহিত্যে পুরনো ঢাকার যে বিচিত্রমাত্রিক অবয়ব অঙ্কিত হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণধর্মী মূল্যায়ন আলোচ্য প্রবন্ধে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রাবন্ধিকের ভাষায় :

> ঢাকা শহর ছড়িয়ে আছে বুদ্ধদেব বসুর বহু গল্প-উপন্যাসে — আকাশ যেমন ছড়িয়ে থাকে মাথার ওপর। ঢাকা শহরকে তিনি কী ভালোই বাসতেন — তা বোঝা যায় ঢাকা শহর সম্পর্কে তাঁর লেখা পড়ে। (রশীদ, ২০০৩ : ২৩৪)

এই সূত্রেই প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেবের *মৌলিনাথ*, *নীলাঞ্জনের খাতা* উপন্যাস এবং *সবিতা দেবী*, *আমরা তিনজন* গল্পে অঙ্কিত ঢাকার যে বর্ণাঢ্য রূপালেখ্য প্রযুক্ত হয়েছে তার দৃষ্টান্ত তুলে

ধরেছেন। স্মৃতিকাতর বুদ্ধদেব বসুর চেতনালোকে ঢাকা শহর যে জীবন্ত রূপ লাভ করেছে তার বর্ণনায় রশীদ করীম উল্লেখ করেছেন :

> ঢাকার স্মৃতি যে বুদ্ধদেব বসুর চিন্তায় একটি বিবর্ণ পাতার মতো পড়ে নেই, বরং তা যে খুবই উজ্জ্বল, এই নস্টালজিয়া যে বারবার ফিরে আসে, তার আর এক প্রমাণ— এখনও যদি প্রমাণের প্রয়োজন থাকে, আমরা দেখতে পাই, ১৯৬০ সালে প্রকাশিত তাঁর 'নীলাঞ্জনের খাতা' উপন্যাসে।
> বরিশাল থেকে স্টিমারে করে ঢাকা যাত্রার বর্ণনা, কিংবা অসপ্রে বিস্ট্রল নামক ছোট জাহাজের উল্লেখ, এসব তো আছেই ; আরো আছে, গোলাপ বাগিচার কথা (এখন যেটা রোজ গার্ডেন), গগনকুটির, তাছাড়া আছে সেই আমলের টিকাটুলির কথা। (রশীদ, ২০০৩ : ২৩৬)

'আহসান হাবীব ও আবুল হোসেন' শীর্ষক প্রবন্ধে বাংলাদেশের এই দুই কবির কবিতার বিষয়-বৈচিত্র্য উল্লেখ করে তাঁদের কবি-প্রতিভার মূল্যায়ন করেছেন লেখক। আধুনিকতার বিচারে দুজনের মধ্যে প্রাবন্ধিক আবুল হোসেনকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করে বলেছেন :

> আমাদের প্রথম আধুনিক কবি কে? ফররুখ আহমদ? আহসান হাবীব? আবুল হোসেন? কে সবচাইতে আগে লিখতে শুরু করেছেন—সেটা বড় কথা নয়। বিষয় ও আঙ্গিকের দিক থেকে কে প্রথম আধুনিক কবিতা লেখেন—কথাটা হচ্ছে তাই। আমি জানি তাঁরা প্রত্যেকেই অনেক ভোট পাবেন। কে সবচাইতে বেশি ভোট পাবেন, তা নিয়ে স্পেকুলেট করলে মন্দ হয় না। আমি কাকে ভোট দেবো ? দেখুন, আমি সিক্রেট ব্যালটে বিশ্বাস করি। তবু বলবো সে-মর্যাদা আবুল হোসেনের প্রাপ্য। (রশীদ, ২০০৩ : ১৮২)

পাঠকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে এ ধরনের মূল্যায়নধর্মী বিশ্লেষণ প্রাবন্ধিক রশীদ করীমের প্রবন্ধসমূহকে বিশিষ্ট করে তুলেছে।

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট দর্শন ও চিন্তা নিয়ে রশীদ করীম বেশ কিছু প্রবন্ধ স্থান দিয়েছেন আলোচ্য গ্রন্থের এ অংশে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের জীবনে কেন প্রাসঙ্গিক, কেনই বা তিনি বারবার আমাদের ভাবনায়, জীবনযাপনে অনায়াসে বিচরণ করেন — এমনই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চেয়েছেন রশীদ করীম নিজেও। 'করুণা ধারায় এসো' প্রবন্ধে তিনি জানান :

> চুপ করে বসে যখন রবীন্দ্রনাথের কথা ভাবি, তখন রবীন্দ্রচিন্তা খাপছাড়াভাবেই মনে আসে। সংঘবদ্ধভাবে মনে আসে না। তাই তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে মৃত্যুদিনের স্মৃতি ফিরে আসে। যেমন হঠাৎ একেবারেই আচমকা তাঁর একটি গানের কয়েকটি কলি মনে পড়ছে ....এই যে আলটপকা রবীন্দ্রচিন্তা ও রবীন্দ্রনাথের গানের কলি বিনা নোটিশে, আমাদের চিন্তায় ও চেতনায় প্রবেশ করে, তাতে এইটেই প্রমাণিত হয় যে, রবীন্দ্রনাথ আমাদের জীবনে প্রবেশ করেছেন। শুধু গ্রন্থে বা গানের রেকর্ডে বা ক্যাসেটে আবদ্ধ হয়ে নেই। তিনি আমাদের ঘর-গেরস্থালির অঙ্গ হয়ে গেছেন। (রশীদ, ২০০৩ : ২৫৩)

রশীদ করীমের জীবনে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ঘর-গেরস্থালির ন্যায় জড়িয়ে আছেন — একথা তিনি অকপটে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর শিল্পভাবনা ও মানসলোকে রবীন্দ্রপ্রভাব প্রেরণার প্রদীপের মতো দেদীপ্যমান। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নানা আবেগ, অনুভূতিজাত চেতনা ও ক্রিয়াকর্মের মতোই যেন রবীন্দ্রনাথ আমাদের সঙ্গী—এমন সত্যকে রশীদ করীম অনুভব করে উল্লেখ করেন :

> রবীন্দ্রনাথের চিন্তা আমাদের মগজে সবসময় সুশৃঙ্খলভাবে উপস্থিত হয় না। আমরা যেমন খাওয়া-দাওয়া লেখাপড়া করি, জানালার কাছে চুপ করে বসে গাছগাছালি ও পাখপাখালি দেখি; স্ত্রীর সঙ্গে সোচ্চারে ঝগড়া করি, আবার চুপ করে বসে থেকে নীরবেই স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা জানাই; সন্তানকে ভালোবাসি ও তিরস্কার করি; এ বই ঘাঁটি সে বই ঘাঁটি; এ ঘর থেকে সে-ঘর যাই; যেমন করে 'হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে, সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে'; তেমনি রবীন্দ্রচিন্তা অলক্ষ্যেই আমাদের চিরসঙ্গী হয়ে থাকে। বহু অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে তাঁর লেখা বিশুদ্ধ সুবাতাসের মতন আমাদের চিন্তাকে স্পর্শ ও চিত্তকে পরিশীলিত করে যায়। (রশীদ, ২০০৩ : ২৫৪)

রবীন্দ্রনাথের *গোরা* উপন্যাস নিয়ে প্রাবন্ধিক রচনা করেছেন 'গোরা উপন্যাসের ক্রমবিকাশ' শীর্ষক প্রবন্ধ। সেখানে তিনি দেখান ঔপন্যাসিক কখনোই হয়ত উপন্যাসের নিয়তি পরিচালনা করেন না, কিন্তু এটুকু উপলব্ধি করতে পারেন যে কোথায় তিনি যেতে চান এবং এই যাবার ক্ষেত্রে উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর চরিত্রে নিজের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেন না। এছাড়া শিল্পে রসসৌধ গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে *গোরা* উপন্যাসের সামাজিক দায় নিয়েও প্রাবন্ধিক মন্তব্য করেন :

> সমাজের কথা এবং কোন পথে সমাজের মঙ্গল তার ঈঙ্গিতও উপন্যাসে থাকে এবং এইসব কথাকে আশ্রয় করেই শিল্পের রসসৌধ গড়ে ওঠে। তাই 'গোরা'তেও তদানীন্তন সমাজের কথা আছে—এবং অত্যন্ত অভ্রান্ত ও পূর্ণাঙ্গ হয়েই আছে। তবু, আমার মনে হয়, একবারে শুরুতে একটা আবছা অস্পষ্ট নকশা রবীন্দ্রনাথের চোখের সামনে থাকলেও, স্থাপত্যকর্মের শেষ ছবিটা একেবারে গোড়াতেই দেখে নিয়ে, তিনি তাঁর কাজ শুরু করেন নি। কতকগুলো মূল ঘটনা তিনি তৈরি করে দিয়েছেন। তাঁর পাত্র-পাত্রীকে এক-একটা স্বভাব দিয়েছেন ; তারপর নৌকা চলেছে স্রোত ও স্বভাবের নিয়মে। তিনি জোর করে নিজের মর্জি চাপিয়ে দেননি। (রশীদ, ২০০৩ : ২২৮)

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রশীদ করীম তাঁর উপন্যাসের শিল্পভাবনা, আদর্শ ও নন্দনতাত্ত্বিক পরিচয় আমাদের সামনে উপস্থাপন করে একটি মূল্যায়নধর্মী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

রশীদ করীম প্রথম শ্রেণির কাব্যামোদী এবং কবিতার নান্দনিক তাৎপর্য তাঁর সত্তায় যে সতত ক্রিয়াশীল তা আমরা অনুধাবন করতে পারি তাঁর রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে। এ প্রসঙ্গে 'রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের মতবিনিময়' শীর্ষক প্রবন্ধে তাঁর একটি মন্তব্য এরকম :

> রবীন্দ্রনাথ আমাদের মানসিক দিগন্তকে প্রসারিত করেছেন একেবারে নিঃসন্দেহে। তার একটি কারণ এই যে রবীন্দ্রনাথ সত্যই একজন খুব বড় কবি। (রশীদ, ২০০৩ : ২১৭)

কেবল রবীন্দ্র-কবিতা কিংবা রবীন্দ্র-উপন্যাস নিয়ে নয়, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তা ও সাহিত্যবিচার করার পদ্ধতিকে গভীরভাবে পাঠ করে রশীদ করীম তাঁর নিজস্ব সাহিত্য বিচারের পদ্ধতি গড়ে তুলেছেন। এ বিষয়টি আমরা উপলব্ধি করতে পারি তাঁর লেখা 'সাহিত্যের বিচারক' প্রবন্ধে। এখানে তিনি রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের বিচারক' প্রবন্ধের উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন এবং মৌল চিন্তাকে বিশ্লেষণ করে আধুনিক কবিতা আলোচনা

করার চেষ্টা করেছেন। কবিতার শিল্পগুণ সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত বিশ্লেষণ আলোচ্য প্রবন্ধের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তাঁর মতে :

> আসলে কোনো কবিতা বিষয়-গুণে মর্যাদা লাভ করে না, করে তার শিল্পগুণে। বস্তুত যেটাকে বিষয়গুণ বলা হয় সেটা কোনো গুণই নয়, সেটা দুর্ভোগ ও দুর্ভাগ্য। (রশীদ, ২০০৩ : ১৯১)

শৈশবকাল থেকেই রশীদ করীম পারিবারিক ঐতিহ্যে রবীন্দ্রচর্চার সুযোগ পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব, মানবচৈতন্যের প্রতি দায় তাঁকে আবিষ্ট করে রেখেছিল বলেই ধারণা করা যায়। যে কারণে রবীন্দ্রনাথের বহুমাত্রিক প্রতিভার মূল্যায়ন করতে গিয়ে তাঁর পল্লিচিন্তা নিয়েও রশীদ করীম প্রবন্ধ রচনা করেন। 'রবীন্দ্রনাথের পল্লীচিন্তা' শীর্ষক রচনায় তিনি রবীন্দ্রনাথের পল্লি-ভাবনাকে উপস্থাপন করেছেন এভাবে :

> রবীন্দ্রনাথের পল্লীচিন্তায় রোমান্টিকতা ও বাস্তবতার একটা বিরোধ ও মিলন চেষ্টা আমরা দেখতে পাই। রোমান্টিকতা তিনি অর্জন করেন নদীবক্ষে হাউসবোটে বসে তীরের পল্লীদৃশ্য দেখে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেন জমিদারির তদারকি করার দায়িত্ব গ্রহণ করে। (রশীদ, ২০০৩ : ২৫৫)

এরপর প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনায় পল্লিচিন্তা কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তার নমুনা তুলে ধরেছেন আলোচ্য রচনায়। এমনকি সমবায় প্রসঙ্গে তিনি রবীন্দ্রনাথের অভিমতও উপস্থাপন করেছেন এখানে। প্রাবন্ধিক হিসেবে রশীদ করীমের কৃতিত্ব এই যে, তিনি যা প্রত্যক্ষ করেছেন তাই তাঁর প্রবন্ধে যুক্তিনিষ্ঠ পদ্ধতিতে উঠে এসেছে। এক্ষেত্রে তিনি কারও পক্ষপাত করেননি।

রশীদ করীম তাঁর মানসলোকে যেসব চিন্তার উদ্রেক হয় তা সরাসরি প্রকাশ করতে কখনো দ্বিধাগ্রস্ত হননি । 'বাংলা একাডেমীর একটি সভা' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি তাঁর ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার খণ্ডচিত্র পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন। আলোচ্য রচনায় 'স্বাধীনতা-উত্তর সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব' শীর্ষক বাংলা একাডেমীর এক সভায় আলোচকদের মতামতের তীব্র সমালোচনা ও ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। সভার মূল প্রবন্ধকার সৈয়দ আবুল মকসুদের মতামত প্রাবন্ধিক রশীদ করীমের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। তাঁর মতে :

> সৈয়দ আবুল মকসুদ তাই করলেন যেটা করা সবচাইতে নিরাপদ : কারণ সকলেই তা করেন। তিনি খুব আস্থার সঙ্গে ঘোষণা করলেন, আমাদের গল্প-উপন্যাস বলতে গেলে কিস্যু হয় নি....কথাটির সত্যতা আমাকে স্বীকার করে নিতে হল ; কিন্তু সৈয়দ আবুল মকসুদের এই কথাটির মধ্যে জখম করার যে প্রবৃত্তি দেখতে পাই সেটাকে সহনীয় করতে পারতেন তাঁর লেখার ভঙ্গিতে নারমিয়াতকে স্থান দিয়ে। সব গল্পলেখক ও ঔপন্যাসিককে তিনি তো একবাক্যে কতল করে দিলেনই, কিন্তু অল্প ক্ষমতা নিয়ে উচ্চাভিলাষী হওয়ার চেষ্টা কোন্ কোন্ গল্প-উপন্যাসে তিনি দেখেছেন সেগুলোর নাম উল্লেখ করে ত্রুটিগুলো ধরিয়ে দিতে পারলে, তাঁর বক্তব্যের যথার্থতা আমরা বুঝতে পারতাম। তিনি একটিও গল্প বা উপন্যাসের নাম করেননি। একটিও যে ভালো হয়েছে তাঁর পাঠ করে বা শুনে তা মনে হয়নি। (রশীদ, ২০০৩ : ২০১-২০২)

রশীদ করীমের সর্বশেষ প্রবন্ধগ্রন্থ *মনের গহনে তোমার মুরতিখানি*-তে পূর্বোক্ত দুটি গ্রন্থের ন্যায় সমকালীন সাহিত্যের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন এবং সাহিত্যাঙ্গনের নানা মুনির নানা মতের বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে। পাশাপাশি রবীন্দ্রসৃষ্টি সম্পর্কে লেখকের আলোকপাত আছে অবধারিত ভাবে। গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ 'বাঙালির মিশ্র সংস্কৃতি'তে তিনি মূলত কবি-সাহিত্যিকের সৃষ্টকর্মে কী প্রতিফলন ঘটেছে তা-ই আলোচনা করেছেন। এ প্রবন্ধে বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে লেখক বাঙালিকে মূলত ধর্মীয় পরিচয়ের গণ্ডিতে বিবেচনা করেছেন। সে আলোকে নীরদচন্দ্র চৌধুরীর বক্তব্য উপস্থাপন করে লিখেছেন :

> ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও নীরদচন্দ্র চৌধুরী বাঙালি সংস্কৃতিতে শুধু মুসলমানদের অবদানই স্বীকার করে নেননি, এ কথাও মেনে নিয়েছেন, মুসলমানদের প্রভাব প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে এতদঞ্চলে সংস্কৃতি যেভাবেই হোক বেগবান ছিল। (রশীদ, ২০০৩ : ৩৭৮)

তাঁর সাহিত্যরুচি ও পাঠপরিধি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট উপলব্ধ হয় তাঁর প্রবন্ধগুলোর মধ্যে এই প্রবন্ধটি শ্রেষ্ঠ। এ প্রবন্ধে অন্যের মন্তব্য খণ্ডন করলেও মৌলিক চিন্তার স্বাক্ষরও রেখেছেন তিনি। বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি ও চিন্তার স্বকীয়তা অন্বেষণের ক্ষেত্রে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

রশীদ করীমের প্রবন্ধের বেশিরভাগ অংশ জুড়ে থাকা রবীন্দ্র প্রসঙ্গও আলোচ্য গ্রন্থের কয়েকটি প্রবন্ধে স্থান পেয়েছে। রবীন্দ্রসাহিত্য ও রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধসমূহ হচ্ছে 'জীবন-মরণের সীমানা ছাড়ায়ে', 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের নাশ নেই', 'রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদা'। 'জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে' রচনার আন্তঃবিষয় রবীন্দ্রচেতনা। রবীন্দ্রচর্চার গুরুত্ব আলোচনা করাই এ প্রবন্ধের মুখ্য দিক। 'রবীন্দ্রসংগীতের নাশ নেই' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের গান যে প্রতিনিয়ত প্রসারতা পাচ্ছে বিদ্বৎসমাজে তারই উল্লেখ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে তাঁর উপসংহারমূলক সিদ্ধান্ত :

> শত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রসার লাভ করছে। এটা আমাদের মনের পরিশীলন যেভাবে ঘটছে সেই ভাবে ততোই ব্যাপক হচ্ছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত আমাদের প্রাণের জিনিস। এর নাশ নেই, এর ক্ষয় নেই। আছে শুধু এর উন্মোচন। সেই প্রচেষ্টায় আমাদের থাকতে হবে। (রশীদ, ২০০৩ : ৪৪৫)

রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি শামসুর রাহমানের প্রসঙ্গও বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের একটি রচনায় সন্নিবেশিত হয়েছে। 'শামসুর রাহমানের রাজনৈতিক কবিতা' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক শামসুর রাহমানের কবিপ্রতিভার মূল্যায়নে সমালোচক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর মতামতের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছেন। প্রবন্ধকারের দৃষ্টিতে শামসুর রাহমানের কবিত্বের শ্রেষ্ঠ দিক তাঁর রাজনৈতিক কবিতাসমূহ। যদিও জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর মতে, প্রেমের কবিতাই শামসুর রাহমানকে পরিচিতি এনে দিয়েছে। রশীদ করীম সমালোচকের এই মতামতের বিরোধিতা না করে বরং দ্বিমত করে বলেছেন :

> যদি প্রেমের কবিতাই শামসুর রাহমানের প্রধান মূলধন হতো, তাহলে জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী এ-কথা বলতে পারতেন না, 'তাঁর কবিতায় বাংলাদেশ তার কবিকে খুঁজে পেয়েছে, এটাই সম্ভবত মূল কারণ'। আমার বিবেচনায়, যদিও শামসুর রাহমান কিছু কিছু সার্থক প্রেমের কবিতা লিখেছেন তবু

> প্রেমের কবিতাই তাঁর কাব্যের মণিহারের সবচাইতে উজ্জ্বল মরকত পান্না নয়। সেই রত্নগুলো পাওয়া যাবে বরং যাকে বলছি রাজনৈতিক কবিতা, সেগুলো সমসাময়িক ঘটনাকে কেন্দ্র করেও চিরকালীন বেদনাকে প্রকাশ করেছে, সেইগুলোর মধ্যে। (রশীদ, ২০০৩ : ৩৮৩)

অগ্রন্থিত প্রবন্ধেও রশীদ করীম স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। কেবল নিজের জীবন নয়, বরেণ্য কথাশিল্পী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর জীবনের খণ্ডাংশকেও তিনি চিত্রিত করেছেন মোহনীয়ভাবে। 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর সঙ্গে একটি দিন' প্রবন্ধ পাঠে তার অন্তরঙ্গ পরিচয় মেলে। তাঁকে রশীদ করীম পর্যবেক্ষণ করেছেন একই সঙ্গে একজন ঔপন্যাসিক এবং বন্ধুস্থানীয় অনুজের দৃষ্টিতে। ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণমূলক যে কয়েকটি লেখা তিনি লিখেছেন, সেগুলোর ভেতর সর্বাধিক সেরা ও উষ্ণতায় সঞ্জীবিত রচনা এটি। স্ববৈশিষ্ট্য অনুযায়ী লেখক এই রচনায়ও কালজয়ী কথাশিল্পীর সৃষ্টিকর্মের সংক্ষিপ্ত অথচ তাৎপর্যপূর্ণ মূল্যায়ন করেছেন। সেই মূল্যায়নের নমুনাংশ এখানে উল্লেখ করা হল:

> আমি বলবো, তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাসটি শেষের চেয়ে ভালো। আবার দ্বিতীয়টি প্রথমটির চেয়ে খারাপ। যদি নয়নচারা গল্পবাদে তার অন্যান্য গল্প দুর্বল হয়ে থাকে এবং লালসালু বাদে তার অন্য দুটি উপন্যাসে পরিপূর্ণতার ঘাটতি থেকে থাকে, তাহলে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর মহত্ত্বের ভিত্তি কী? একি তাহলে শুধুই মিথ? না তা নয়। লালসালু এখন এক কালজয়ী উপন্যাস। চাঁদের অমাবস্যা কিছুটা অপূর্ণ হলেও এ উপন্যাস থেকে তবুও এমন কিছু খুঁজে নেয়া সম্ভব, যা হীরকখণ্ডের মতো জ্বলজ্বল করবে। নয়নচারায় বেশকিছু চমৎকার ছোটগল্প আছে। এই সবই তাঁর খ্যাতির মতো জ্বলজ্বল করবে। (রশীদ, ২০০৩ : ৪৭৭)

ওয়ালীউল্লাহর সৃষ্টিশক্তি সম্পর্কে লেখকের সচেতনতা প্রশংসার মর্যাদাবাহী।

প্রাবন্ধিক রশীদ করীমের প্রথম উপন্যাস *উত্তম পুরুষ* রচনার প্রেক্ষাপট, এর কাহিনী সংগঠন ও চরিত্রচিত্রণ নিয়ে তাঁর বিশ্লেষণধর্মী মূল্যায়ন স্থান পেয়েছে 'উত্তম পুরুষ' শীর্ষক প্রবন্ধে। পাশাপাশি এটি যে তাঁর আত্মজীবনীমূলক তারও উল্লেখ করে বলেছেন :

> উত্তম পুরুষ বহুলাংশে আত্মজৈবনিক। এই বইয়ে আমার আব্বা, আম্মা ও অব্যবহিত অগ্রজ ভাইয়ের প্রতিকৃতি আছে। তবে মেজো ভাই বলে যাকে চিহ্নিত করা হয়েছে তিনি আসলে আমার চতুর্থ ভাই। আজ তারা কেউ বেঁচে নেই। কিন্তু উপন্যাসটি পড়লে তাদের খুঁজে পাই; ....আমার স্কুল জীবনের কথাও বেশকিছুটা বলা হয়েছে। (রশীদ, ২০০৩ : ৪৮৬)

'সাহিত্যের বর্তমান মান' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখকের অভিমত পূর্বের মতো এখন আর সৃষ্টিশীল সাহিত্য খুঁজে পাওয়া যায় না। বাংলা সাহিত্যে মানের বিচারে যে সকল রচনা প্রশংসিত হয়েছে তার উল্লেখ করে তিনি বর্তমান সাহিত্যের কোনো ইতিবাচক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারেননি। এ বিষয়ে তাঁর অভিমত :

> বর্তমানে সাহিত্যের মান পৃথিবীর সর্বত্র পড়ে গেছে। এখন যাঁরা নোবেল প্রাইজ পান তাঁদের লেখা পড়বার কোনো উৎসাহও পাই না এবং ক্ষমতা তো নেই। আর একটা কথা বলা দরকার তা হলো, কবিরা যেমন ফেব্রুয়ারি মাসের পয়লা ও দোসরা তারিখে ঢাকায় কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত করেন, তেমনি গল্প-উপন্যাস লেখকরা কেন সেই রকম একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন না? (রশীদ, ২০০৩ : ৪৯১)

সমালোচক ও প্রাবন্ধিক হিসেবে রশীদ করীম চিৎপ্রকর্ষের স্বাক্ষর আঁকতে চেয়েছেন, পেরেছেনও। তাঁর প্রবন্ধ পাঠে সহজে ধরা পড়ে, রশীদ করীম কথাসাহিত্যের আলোচনায় যতটা কঠোর ও নেতিবাচক ধারণা পোষণ করেন, কবিতার আলোচনায় ততোটাই কবিতাবান্ধব। নিজে কথাসাহিত্যিক হওয়ার সুবাদে অন্য কথাসাহিত্যিকের দুর্বলতা সহজে শনাক্ত করতে পেরেছেন, কিন্তু কবিকে দেখেছেন কেবল প্রেমের দৃষ্টিতে, মুগ্ধতার সঙ্গে। তাঁর প্রবন্ধ আমাদের মননশীল রচনাধারায় একেবারে নতুন একটি স্বাদ এনে দিয়েছে। এর মাধ্যমে তিনি মনের গহনের সংবাদ যেমন তুলে এনেছেন, তেমনি মননের স্বাক্ষরও রেখেছেন। আর এখানেই প্রাবন্ধিক রশীদ করীমের প্রাতিস্বিকতা সুচিহ্নিত।

টীকা

১. তিনটি প্রবন্ধ-সংকলনের নাম নিম্নরূপ :
   ক. *আর এক দৃষ্টিকোণ*, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৮৯, বৈশাখ ১৩৯৬
   খ. *অতীত হয় নূতন পুনরায়*, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯২, আষাঢ় ১৩৯৯
   গ. *মনের গহনে তোমার মুরতিখানি*, প্রথম প্রকাশ, মে ১৯৯৭, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৪
উপর্যুক্ত তিন সংকলনের সকল প্রবন্ধ নিয়ে রশীদ করীমের *প্রবন্ধ-সমগ্র* ২০০৩ সালে সাহিত্য প্রকাশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

২. লেখকের অগ্রজ আবু রুশদ মতিনউদ্দিন ১৯১৯ সালের ২৫ ডিসেম্বর ২৭ নম্বর এলিয়েট লেন কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। হুগলী কলেজ ও কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যাপনার পর ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট দেশভাগের দিনই তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় চলে আসেন। চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও সিলেট কলেজে অধ্যাপনা করেন তিনি। তদানীন্তন কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের সহকারী শিক্ষা উপদেষ্টা এবং পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সহকারী জনশিক্ষা পরিচালক হিসেবেও কিছুদিন কাজ করেছেন তিনি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জনশিক্ষা পরিচালক পদে নিয়োগ পান। সরকারি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের পর দীর্ঘদিন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। ছোটগল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক হিসেবেও পরিচিতি পেয়েছেন।

৩. *এলোমেলো* অগ্রজ আবু রুশদের লেখা প্রথম উপন্যাস যা ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি

মোহাম্মদ নূরুল হক, ২০১১। *প্রাবন্ধিক রশীদ করীম*, রশীদ করীম সংখ্যা, দৈনিক ইত্তেফাক, সাহিত্য সাময়িকী।

রশীদ করীম, ২০০৩। *প্রবন্ধ-সমগ্র*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

সরদার আবদুস সাত্তার, ২০১০। *কথাসাহিত্যের আঙিনায় দাঁড়িয়ে*, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা।

হামিদ কায়সার ও পিয়াস মজিদ সম্পাদিত, ২০১১। *তরুণ আলোয় রশীদ করীম নির্বাচিত সাক্ষাৎকার*, শুদ্ধস্বর, ঢাকা।